সাগরের জোয়ার-ভাটা রাজনির্দেশ মানে না

অমিত ভাদুড়ি

যা তাঁর নজরে পড়েছে, তাই-ই তাঁর শাসনের অধীন হয়েছে বলে তাঁকে সমীহ করা হত। তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম রাজা ক্যানিউট। তিনি সমুদ্রজোয়ারের ঢেউকে হুকুম করেছিলেন তাঁর রাজপদ ও রাজপোষাক যাতে না ভিজে যায় তাই পিছু হঠে যেতে। তাঁর সভাসদ ও পারিষদবর্গের হতবুদ্ধি-বিব্রত-অবস্থার সীমা ছিল না যখন রাজার ঈশ্বরিক ক্ষমতা সত্ত্বেও সাগর রাজহুকুম পালন করল না। চাটুকারিতা দিয়ে পুষ্ট ক্ষমতার দম্ভকে সত্য কথাটি শুনিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রবাদকথাটি আজও টিকে আছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত নেতার উপর ঈশ্বরিক ক্ষমতার বিভূতি আরোপ করে না। কিন্তু তা সেই নেতা বা নেত্রীকে একনায়ক না হলেও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়। আইনসভায় পাশ করা আইনের মাধ্যমে সেই নেতা বা নেত্রীর গণতান্ত্রিক শাসন চালানোর কথা। বিশেষত সমসাময়িক সময়পর্যায়ে বিশ্বের বহু দেশে অতিমারীর অজুহাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার নতুন চাষ দেখা যাচ্ছে নানারূপে— কখনও বিরোধীপক্ষকে গরহাজির রেখে আইনসভার নামে ভুতুড়ে প্রহসন হাজির করে, কখনও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরী অবস্থার নাম করে আইনসভাকে মুলতুবি রাখার মধ্য দিয়ে, বা কখনও নেহাত নির্মম সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া প্রভাব প্রসূত অভ্যাসের টানে পুনর্বার ভোট হওয়া অবধি (আদৌ যদি তা হতে দেওয়া হয়) যা খুশি করার ঔদ্ধত্যে।

ইতিমধ্যেই ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে যে সম্প্রতি ভারতের আইনসভায় তিনটে কৃষি বিলকে আইনে পরিণত করা হয়েছে, যা কৃষকদের প্রতিবাদের জোয়ার ডেকে এনেছে। এই কৃষক-প্রতিবাদের জোয়ারে প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর ক্রমশ ভারতের আরো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরো বেশি বেশি কৃষকরা এতে যোগ দিচ্ছেন। এই কৃষকরা চান যে নতুন তিনটি কৃষি আইনকে বাতিল করা হোক। তাঁরা চান যে সমস্ত অত্যাবশ্যক কৃষিপণ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের প্রসঙ্গে অলিখিত মৌখিক আশ্বাসের বদলে লিখিত আইন করা হোক। সরকার তা করতে অনিচ্ছুক।

কৃষক-প্রতিবাদের ফুলে ওঠা জোয়ারের ঢেউ গণতান্ত্রিক নেতার সিংহাসন অবধি পৌঁছে তাঁর পদযুগল ও পোষাকাদিকে ভিজিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিল, কিন্তু বলপ্রয়োগে তা থামানো হয়েছে। জাতীয় সড়ক খুঁড়ে পরিখা কেটেছে— না কৃষকরা নয়— কেটেছে পুলিশেরা সরকারি নির্দেশে, ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে, জলকামান দাগা হয়েছে কৃষকদের উপর। কিন্তু তবুও প্রতিবাদের ঢেউ মিলিয়ে যায়নি, তা আরও ফুলেফেঁপে উঠতে থেকেছে এবং রাজধানীর সীমানায় বাছাই করা কিছু প্রবেশপথে শান্তিপূর্ণভাবে দানা বাঁধতে থেকেছে। প্রতিরোধ ক্রমশ আরও বিপুল আকার ধারণ করে ভারতের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নেতা বলছেন যে তাঁকে ভুল বোঝা হচ্ছে। তিনি বলছেন যে তাঁর দেখানো পথে চললে বছর-দুয়েকের মধ্যেই কৃষকদের উপার্জন দুই গুণ হয়ে যাবে, আইনগুলো ধনসৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্যই আনা হয়েছে। নেতার সভাসদ-পারিষদবর্গ ও উপদেষ্টারাও সবাই বাজার-অর্থনীতির জাদুতে বিশ্বাসী। সেই মত অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য খোলা বাজারের বিরোধী, তাই ধনসৌভাগ্য বৃদ্ধির পথে বাধা,

কেবলমাত্র খোলা বাজারই জাদু ফলাতে পারে। এই তিনটি নতুন আইন খোলা বাজার তৈরির জন্যই আনা হয়েছে। এ হবে এমন এক খোলা বাজার যেখানে যেখানে নিজেদের কৃষিপণ্যের খুচরো বিক্রির বিপণিশৃঙ্খলকে আরও বিস্তৃত করতে উদগ্রীব আমবানি মহাশয়ের টিম বা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলা প্রাণিশস্যাগারগুলোকে শস্য মজুত করে ভরিয়ে তুলতে বেপরোয়া আদানি মহাশয়ের লোকজন কৃষকদের সঙ্গে ফসল নিয়ে দর-কষাকষিতে নামবে, যে কৃষকদের অধিকাংশই দুই একরের কম জমির মালিক। তার উপর আবার, যদি কোনও বিবাদ-ভিন্নমত দেখা দেয়, কোনও দেওয়ানী আদালতে তার মীমাংসা হবে না, যে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছে সে-ই সেক্ষেত্রে রায় দেবে, যে সব রাজ্যে চাষের জমি অবস্থিত সে সব রাজ্যেরও সেখানে কিছু বলার এক্তিয়ার থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকারই আইন প্রণয়ন করবে, তা কার্যকরী করবে, বিবাদ মীমাংসাও করবে— ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ক্ষমতার পৃথকীকরণের বদলে এ এক চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন। কৃষকরা বলছেন যে তাঁরা এহেন আইনকানুন চান না, কিন্তু নেতা অতি ভাবগম্ভীর গলায় বারংবার প্রচারমাধ্যমে বলে চলেছেন যে তাঁকে ভুল বোঝা হচ্ছে। বড়সড় প্রচারমাধ্যমে নেতার সভাসদবর্গ ও পারিতোষিক-প্রাপ্ত পণ্ডিতরা আবেগের তুঙ্গে উঠে পুনরাবৃত্ত করে যাচ্ছেন যে সত্যিই নেতাকে ভুল বোঝা হচ্ছে। কেন এই ভুল বোঝা—তার কারণ খোঁজারও হিড়িক পড়ে গেছে— মনে হয় পাকিস্তানিরা, খালিস্তানিরা, মাওবাদীরা আর শহুরে নকশালরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধেছে, বিবিধ বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তাদের মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে— তারাই নিশ্চয় অবোধ কৃষকদের ভুল বোঝাচ্ছে!

এ অবশ্য এই প্রথম নয়। মুসলিমরা সি-এ-এ-কে ভুল বুঝেছিল। কাশ্মীরীরা ৩৭০ ধারা বাতিলের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেনি। জি-এস-টি বোঝার ব্যাপারে অবুঝ ভান করেছিল ব্যবসাদাররা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যে গরিবদের তারা বিমুদ্রাকরণের মাহাত্ম্য বোঝেনি। এমনকি পরিযায়ী শ্রমিকরাও হঠাৎ-ডাকা লকডাউনের দ্বারা কোভিড ভাইরাসের থেকেও বেশি কার্যকরীভাবে ধ্বংস হতে হতেও সেই লকডাউনের গরিমা উপলব্ধি করতে পারেনি। তবু কিছুর পরোয়া না করে মহান নেতা কঠোর সংকল্পের সঙ্গে দেশকে সর্বদিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

মহান নেতাকে বুঝতে সক্ষম কেবল প্রকৃত দেশপ্রেমী('দেশভক্ত')-রা, আর তাঁর বিরোধিতা করে কেবল দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক('দেশদ্রোহী')-রা। নেতার সমালোচনা করে কেবল সেই 'টুকরে-টুকরে-গ্যাঙ'-য়ের আপদরা যারা আমাদের অতীত গরিমাস্নাত নির্মীয়মান হিন্দুরাষ্ট্রকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চায়। এই আপদরা আসলে এই দেশের লোকই নয় কারণ তারা এই দেশের সংস্কৃতি বোঝে না, বোঝে না কী মহৎ বৈজ্ঞানিক পরম্পরার মধ্যে আমরা আছি যেখানে গণেশ দেবতার মুখ প্লাস্টিক সার্জারি করে হাতির মুখে পরিণত করা হয়েছিল, যেখানে অতি প্রাচীন কালেই আমাদের জ্ঞানী ঋষিরা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন কীভাবে বাসন বাজিয়ে আওয়াজ করে আর মোমবাতি জ্বালিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই অতিমারীকে কাবু করে ফেলা যায়। এ অবশ্য বলা মুশকিল যে নেতার সব সভাসদ, সব মন্ত্রী-আমলা, সব পণ্ডিত ও সব মূলধারার প্রচারমাধ্যম নেতার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত কিনা। এই ধারার রাজনীতিতে খেলার নিয়মগুলো হল বোঝাবুঝির বদলে চাটুকারিতা, প্রশ্ন করার বদলে আনুগত্য, ভিন্নমতের বদলে বশ্যতা।

ভাইকিঙ রাজা ক্যানিউট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বেশিরভাগটাই তাঁর শাসনের অধীনে এনেছিলেন এবং বলপ্রয়োগ করে ব্রিটেন জয় করেছিলেন। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ দাবি করে যে তিনি আসলে

একজন বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন, রাজার অসীম ঈশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করার পক্ষে বোধহয় একটু বেশিই বুদ্ধিমান ছিলেন। রাজনির্দেশের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী বলের দ্বারা যে সমুদ্রজোয়ারের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, তা তিনি বুঝতেন।আর বলতে গেলে, সেই বিশেষ দিনে তাঁর সিংহাসনটিকে সমুদ্রের ধারে বসানো হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁর বুদ্ধিমত্তার একটি প্রদর্শন দিতে। তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর সভাসদদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চাটুকারিতা আসলে সরল জ্ঞানকেও পিছনে সরিয়ে রাখে। সেই সমুদ্রপারের ঘটনাবলী ছিল তাঁর সভাসদ ও প্রজাদের কাছে তাঁর'মন কী বাত'-য়ের একটি জোরালো উপস্থাপনা। সেইজন্যই তা হাজার বছর পার করেও ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেছে, প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। সমুদ্রজোয়ার যে রাজনির্দেশের চেয়ে বেশি শক্তিধর, এই সরল সত্য বোঝা ছিল তাঁর সময়ের বুদ্ধিমত্তা। আমাদের সময়ের বুদ্ধিমত্তা বলে যে আইনসভা প্রণীত যে কোনও আইনের চেয়ে বিপুল জনসমর্থনধারী গণ-আকাঙ্খার ঢেউ অনেক বেশি শক্তিশালী। এই সরল সত্যকে কমনীয়ভাবে স্বীকার করে নেওয়ার বুদ্ধিমত্তা কী আমাদের সময়ে আমাদের দেশে আছে?

মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ– বিপ্লব নায়ক।

একটি অত্যন্ত স্বতন্ত্র আন্দোলন থেকে পাওয়া শিক্ষা

অমিত ভাদুড়ি

একটি দানব, যার আকৃতি পুরোপুরি জানা নেই, সম্প্রতি আহত হয়েছে। কিন্তু কতটা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে তা এখনও সবটা জানা যায়নি। কেবলমাত্র ভবিষ্যতই তা জানান দেবে। বলা হয়ে থাকে যে দুরাত্মায় পরিণত হওয়া ভারতীয় সংখ্যাগুরুবাদী গণতন্ত্র এই দানবটির সৃষ্টিকর্তা। কেউ বলে যে সঙ্গত বা অসঙ্গত, সাংবিধানিক বা অসাংবিধানিক বিবিধ উপায়ে সংবিধানকে বিকৃত করার উপর্যুপরি প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই দানবের জন্ম হয়েছিল। দানবটি ক্রমাগত তার আকৃতিও বদল করে চলছিল। কখনও কখনও তার আবির্ভাব ঘটছিল এমনসব শূণ্যগর্ভ আইনি ধাঁচায় যা সত্যসার খুইয়ে ফোঁপরা হয়ে উঠেছে, আর তাকে পেশ করা হচ্ছিল এমন অতিপ্রয়োজনীয় সব আইনের সাজে যা কিনা ভিতরের ও বাইরের সন্ত্রাসবাদীদের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করতে খুবই প্রয়োজন। এই দানবপ্রবর রোগলক্ষণাগ্রস্ত জাতীয়তাবাদের এমন এক নিদর্শনকে প্রচার করছিল যার উদ্দেশ্যই হল যে কোনও ভাবে, দরকার হলে গায়ের জোরে সমস্ত বিরোধ ও ভিন্নমতের গলা টিপে ধরে সমস্ত মতের পার্থক্যকে দুরমুশ করে সমান করে দেওয়া। ইত্যবসরে দেশের প্রতিটি কোণেই সে তার উপস্থিতির জানান দিচ্ছিল গরীব মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করার অভিযান চালিয়ে— কখনও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানোর নামে, কখনও বা কালো টাকা আর দুর্নীতি বিলোপ করার নামে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের এই দেশে যেখানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্প্রচারিত প্রতিমা প্রতিস্থাপিত করেছে বাস্তব ছবিকে, বিজ্ঞাপনই হয়ে উঠেছে সংবাদ আর প্রকৃত সংবাদকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে, সেখানে এই দানবপ্রবর রাজ করছেন।

এই বহু-মাথা-বিশিষ্ট দানবপ্রবরকেগুরুতর আঘাত করার ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে যায়নি। এই আঘাত করার শক্তি বেশ বড় সংখ্যক ভারতীয় কৃষকেরা সংহত করেছিলেন অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস ও নাছোড় মনোভাবের জোরে। প্রথমে তাঁরা রাজধানী শহর দিল্লির সীমানায় অস্থায়ী তাঁবু, ট্রাক্টর ও ট্রলিতে জড়ো হয়ে অবস্থানশুরু করেছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জারি ছিল তাঁদের অবস্থান। তাঁদের রাজধানী শহরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। তবু তাঁরা লক্ষ্যণীয় ধৈর্য্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে অবিচল থেকে কেবল অপেক্ষা করে যাচ্ছিলেন কখন তাঁদের কথা শোনা হবে। সদ্য সংসদে সরকার তিনটি কৃষি বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে আর সংসদের উচ্চ কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার আশঙ্কায় সন্দেহজনক তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে ধ্বনিভোটে গৃহীত করিয়ে নিয়েছে— এই তিনটে কৃষি বিলকে জড়ো হতে থাকা কৃষকরা মেনে নেওয়া যায় না বলে মনে করেছিলেন। সরকার প্রথমে দাঙ্গাকারী জনতাকে ছত্রখান করার মতো জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, ইত্যাদি প্রয়োগ করে গড়ে উঠতে থাকা কৃষক সমাবেশকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যখন তা কাজে দিল না, তখন দিল্লির মূল প্রবেশপথমুখী রাস্তাগুলোয় ব্যারিকেড তুলে কৃষকদের আটকে দেওয়া হল। কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা চালানোর একটা দেখনদারিও হাজির করার চেষ্টা করল সরকার। বহু মাস জুড়ে ছড়ানো সর্বমোট এগার দফা বৈঠকে সরকার এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা এড়িয়ে গেল যে কৃষকরা কেন তিনটি কৃষি আইনের প্রত্যাহার চান। অচলাবস্থা চলতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে কৃষকরা একটি নতুন কৌশল ছকে ফেলেছিলেন। সরকার কৃষকদের ব্যারিকেড ও পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, এখন কৃষকরা আরও বেশি বেশি সংখ্যায় চারপাশের গ্রামগুলো থেকে এসে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল আর বিভিন্ন সমাবেশবিন্দুতে গোটা অঞ্চলটাকে ঘিরে ফেলল। সরকার তারস্বরে কৃষকদের দোষারোপ করতে লাগল যে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতবিরোধী বা নকশাল-মাওবাদী-দের মতো অতিবামপন্থী! আমার এক বন্ধু মজা করে বলেছিল: মাও বলেছিল

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কথা, মাওয়ের নাম কোনওদিন না শুনলেও কৃষকরা ঠিক তাই-ই করছে— আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদী আর তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে কৃষকদের মাওবাদী হওয়ার উদ্ভট অভিযোগ তুলেছেন, এ যেন তার এক আধিবিদ্যক ন্যায্যতা প্রতিপাদন করছে! কৃষকরা এই সমস্ত কিছু নিজেরা সংগঠিত করে চলেছিল, কিন্তু হিংসার লেশমাত্র চিহ্ন তাতে ছিল না।

মূলত স্বনিযুক্ত কৃষকদের গোটা পরিবারই কাছেপিঠের গ্রাম থেকে সাধারণভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ ভাগ করে নিয়ে তারা তাদের ক্ষেতের কাজ বজায় রাখছিল। প্রতিদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় মহিলারা আসত, আর তাদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংকল্পও আরও বাড়তে বাড়তে সবার কল্পনাকেও ছাপিয়ে যেত। খামারে বা কারখানায় কাজ করা দিনমজুরদের থেকে তাদের প্রতিরোধে টিকে থাকার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। তাদের দৈনিক জীবনযাপনের মধ্যে থেকে উঠে আসা কষ্টসহিষ্ণু দৃঢ়তা ও নাছোড় মনোভাব এখন আন্দোলনের সংঘটনে নিযুক্ত হয়ে এমন এক রূপ নিল যা সরকারের কাছে অকল্পনীয় ও ভয়ানক হয়ে উঠল কারণ সরকার কেবলমাত্র হিংসাত্মক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই শেষ টানার পথের জন্য তৈরি ছিল। সরকারের উৎকণ্ঠার পারদ তাই ধীরে ধীরে ক্রমশ চড়ছিল।

এইসমস্ত এলাকার অনেকগুলোতেই, বিশেষ করে পাঞ্জাব-সংলগ্ন হরিয়ানার গ্রামগুলোতে পিতৃতান্ত্রিকতার বাঁধন অতি দৃঢ়, গ্রামসভাগুলোয় বা 'খাপ পঞ্চায়েত'-য়ে উঁচু জাতেরা আধিপত্য খাটায় এবং ভয়ঙ্কর জাতপাতের নিপীড়ন ঘটে চলে। কৃষিমজুররা মূলত দলিত সম্প্রদায়ের, তারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করছিল কারণ তারা উপলব্ধি করেছিল যে তাদের বাঁচার সম্বল যে খাদ্যদ্রব্যের গণবন্টন ব্যবস্থা, এই কৃষি-আইনগুলোর হাত ধরে অচিরেই সেই গণবন্টন ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে বেসরকারি বাণিজ্য ও মুনাফাদারির অবাধ ব্যবস্থা কায়েম করা হতে চলেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে খবর সংগ্রহ করতে ঘোরা গণপ্রচারমাধ্যমের

কর্মীরা দেখে অবাক হয়ে তাঁদের প্রতিবেদনে জানাচ্ছিলেন যে কেবলমাত্র দিল্লি-সীমান্তের সমাবেশগুলোতেই নয়, অন্যত্র গ্রামগুলোতেও প্রথাগত ভাগাভাগির দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ছে; শ্রেণি, জাতপাত, লিঙ্গভেদ ও ধর্মের অপরাপর সব অংশ একটা বৃহৎ আন্দোলনে একসঙ্গে ঝালাই হয়ে উঠে আসছে একটাই উদ্দেশ্য সামনে রেখে: কৃষি-আইন প্রত্যাহার কর এবং বিবিধ কৃষিপণ্যের বেচাকেনায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত কর। এই পর্যায়ে এসে সরকার ও শাসকদল বিজেপি-র বিচ্ছিন্নতা প্রায় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল— গ্রামে কৃষকরা বিজেপি-কর্মীদের সোজাসুজি বয়কট করতে শুরু করেছিল, বিজেপি-র রাজনীতিবিদদের জনসমক্ষে কোথাও ভাষণ দেওয়ার কর্মসূচী থাকলে আগে থেকেই সেই স্থান ঘেরাও করে ফেলছিল। শাসকদলের সদস্যরা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, কোথাও যাতায়াত করতে তাঁদের পুলিশের সুরক্ষাবলয়ের প্রয়োজন পড়ছিল।

কৃষক আন্দোলনের ঠিক কয়েক মাস আগে মোদী-শাহ-রাজ এক অনভিপ্রেত ফল ফলিয়েছিল— খোলাখুলিভাবে মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে তাক করা নাগরিকতা সংশোধন আইন (সিএএ)-য়ের প্রতিবাদে হাজার হাজার মুসলমান মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয়ে পথে নেমে এসেছিল। আন্দোলনের পরিসরে মহিলাদের টেনে আনার এই অনভিপ্রেত ফল মোদী-ঘরানার চকিত বিস্ময়কর ঘোষণার বিরুদ্ধে অতি কার্যকরী ওষুধের কাজ করতে শুরু করেছিল কারণ তা মোদীকেই পাল্টা বিস্ময়ে হতচকিত করে তুলেছিল, যদিও রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষরাও সাধারণত এর সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। মোদী-ঘরানার চকিত বিস্ময়কর ঘোষণা পূর্ববর্তীকালে খুবই সফলকাম হয়েছিল যখন মোদী বিমুদ্রাকরণের ঘোষণা করেছিলেন বা কোনও প্রস্তুতি ও হুঁশিয়ারি ছাড়াই হঠাৎ অতি কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন।

এমনকি, কৃষি আইন পাশ করানোর ঠিক আগে-আগেই মোদী সরকার সংসদের মধ্য দিয়ে তড়িঘড়ি করে শ্রমিক-বিরোধী আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার সময় তুলনায় খুব কমই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল

যেহেতু পার্টি-ভিত্তিক বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলো লাগাতার কার্যকরী প্রতিরোধ তৈরি করতে অসমর্থ প্রমাণ হয়েছিল। এই পটভূমিকায় অত্যন্ত সাহসী হয়ে ওঠা সরকার তিনটি কৃষি আইন পাশ করাল যা কার্যত দেশে সরকারিভাবে শস্য কেনা ও খাদ্য বন্টন করার গোটা ব্যবস্থাটাকে শাসকদলের ঘনিষ্ঠতম দুই করপোরেট ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতির সূচনা করে। এই দুই করপোরেট ব্যবসায়ী গুজরাট থেকে উঠে আসা ভারতের সবচেয়ে বড় দুটি শিল্পবাণিজ্য সংস্থা।

দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য পুরোমাত্রায় নীরব প্রস্তুতি নিয়ে কৃষকরা রাজধানী দিল্লির কিছু কিছু প্রবেশপথের মুখে প্রায় অস্থায়ী নগরপত্তন করতে শুরু করে দিয়েছিল। এখন নতুন আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও নতুন উদ্যোগ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কোনও রাজনৈতিক দলের পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ না করে তাদের নেতৃত্ব ছিল একদম তাদের নিজেদেরই। বরং রাজনৈতিক দলগুলোই এই বিপুল আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হচ্ছিল। ছত্রিশটি কৃষক সঙ্ঘ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও সদস্যকূল নিয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল, নিজেদের মধ্যে অনবরত বিতর্ক ও আলোচনা চালোনোর মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল এবং একবার সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তাতে পাথরপ্রতিম দৃঢ়তা নিয়ে অনড় থাকছিল। নিজেদের অজান্তেই তারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছিল প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ কী হতে পারে ও তার প্রয়োগে কী অর্জন করা যেতে পারে। আন্দোলনটি ছিল আগলমুক্ত ও স্বচ্ছ, সমস্ত উসকানির মুখে স্থিতধী ও শান্তিপূর্ণ, এবং আন্দোলনের মধ্যের প্রত্যেকের সার্বিক সমর্থনের বলে বলীয়ান হয়ে অজেয়। উপর থেকে আরোপিত পার্টি-শৃঙ্খলার ধারণা-অভ্যাসকে রূপান্তরিত করে তা একটি উদ্দেশ্য বিধানের জন্য স্ব-আরোপিত সহযোজিত শৃঙ্খলা সহ স্বতপ্রণোদিত অংশগ্রহণের রূপ দিয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক আন্দোলনটি প্রায় এক বছর আগে ২০২০ সালের ২৬শে নভেম্বর শুরু হয়েছিল। আর তা তার প্রথম কৌশলগত বিজয় অর্জন করল ২০২১ সালের ১৯শে নভেম্বর, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হঠাৎই দূরদর্শনের পর্দায় হাজির হয়ে তাঁর পশ্চাদগমন ঘোষণা করলেন, তিনটে কৃষি আইন ফিরিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করলেন।

এর আগে ২০১৬ সালে মোদীর বিমুদ্রাকরণ সংক্রান্ত হঠাৎ-ঘোষণার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল কালো টাকা নির্মূল করা। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে তা করা হয়েছিল। এর ফলে তাঁর পার্টি বিজেপি নির্বাচনী ব্যয়ের অর্থসংস্থানের দিক থেকে তার প্রতিযোগীদের তুলনায় বিপুল সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল কারণ প্রতিযোগী পার্টিগুলো যখন এই আচমকা ঘোষণার জন্য তৈরি না থাকায় অপ্রস্তুতিতে আটকে পড়েছিল, বিজেপি তখন আগে থেকেই ভিতর থেকে খবর পাওয়ার সুবাদে সব গুছিয়ে নিতে পেরেছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী তাঁর জনপ্রিয়তার শিখরে বিরাজ করছিলেন আর কালো টাকার বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা করা শ্বেতরক্ষী যোদ্ধাকূলমণি হিসেবে নিজের প্রতিমূর্তিটি বেশ ভালোই বেচতে পেরেছিলেন, যদিও তার আগে তাঁর দেওয়া বিদেশ থেকে কালো টাকা সব উদ্ধার করে এনে প্রতিটি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পনের লাখ টাকা ভরে দেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। তবু গরীব মানুষজন খুশি মনেই কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছিল কারণ তখনও তারা তাদের প্রধানমন্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখত, আর উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতেছিল। সেই সময়টা ছিল ২০১৭ সাল।

সেই উজ্জ্বলতা এখন ফিকে হয়ে গেছে। ভারতের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা সম্পন্ন ও সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধি সংসদে পাঠানো রাজ্য উত্তরপ্রদেশে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই দেশের পুবদিকে পশ্চিমবঙ্গে আর দক্ষিণদিকে তামিলনাড়ুতে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বেশ খারাপভাবে হেরেছে। উত্তর ও মধ্য

ভারত এখন এই নির্বাচনী লড়াইয়ের পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র, আর সেখানকার বহু অঞ্চলেই এই কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধেছে। বিজেপির অভিপ্রায় যে তারা হিন্দু দেবতা রামের নামে একটা বিশাল মন্দির বানাবে আর তারা আশা করে আছে যে পরম্পরাগতভাবে দেশের এই হিন্দু কেন্দ্রস্থলে তাদের হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণের কৌশল কাজে দেবে। বিজেপির এই বিভেদমূলক ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কৃষকরা কি অন্যকিছু সামনে নিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে যখন এই কৃষকদের বহুজনই নিজেরা পরম্পরাগতভাবে হিন্দু ? তাঁদের অনেকেই স্বীকার করেছেন তাঁরা এই হিন্দুত্বের কারণেই গত নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, আর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার নানা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এই কৃষি আইনগুলো সরকারের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন সেই রাজনৈতিক বোঝাবুঝি নিজেদের মতো করে সম্পন্ন করে কৃষকরা যখন সামনে এগিয়ে এলেন, বিজেপির আলো ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করল। আন্দোলন শুরুর পরে পরেই কৃষকরা স্পষ্টভাবে তিনটি নির্দিষ্ট বড় করপোরেট স্বার্থকে চিহ্নিত করেছিল যাদের দিকে তাকিয়ে এই কৃষি আইনগুলো তৈরি হয়েছে। এই করপোরেটদের হাত থেকে খুদ খাওয়া পায়রারাই চারদিকে বকম বকম করছে— রাজনীতিবিদগণ, যাদের নেতৃত্বে আছেন মোদী, গণপ্রচারমাধ্যমের সব ডাকাবুকো মুখ, উদারনীতিবাদী বাজার-সংস্কারকগণ, এমনকি বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফ-ঘরানার অর্থনীতিবিদকূল যাঁরা সব সরকারকেই অলঙ্কৃত করে বিরাজ করেন— এই পায়রার দলের মধ্যে কৃষকরা কেবল থলি থেকে বিড়ালটাকে বের করে ছেড়ে দিল। গুজরাটের সবচেয়ে বড় দুজন শিল্পপতি, যাঁরা আবার প্রধানমন্ত্রী মোদীরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকারী, তাঁদের বাণিজ্যিক-আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এই কৃষি আইন— কৃষকরা তা সোজাসুজি বলে দিল। জমিতে কিছু প্রমাণও অবশ্যই ছিল— আদানির শস্যগুদাম হিসেবে ব্যবহারের জন্য নবনির্মিত সব বিশাল 'সিলো', আম্বানির খুচরো খাদ্যের বাজারে প্রবেশ ও অনলাইন বড় পরিমাণ কেনাকাটার ক্ষেত্র দখলের প্রস্তুতি, এগুলো ছিল চোখের সামনেই।

কৃষকদের নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা লঘিষ্ঠবাদী (minimalist) মতাদর্শ জীবন্ত ও সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সহজভাবে খোলাখুলি তারা তা প্রকাশ করতেও ভয় পেত না। এ তো উপর থেকে হুকুমনামা দিয়ে চাপানো কোনও পার্টি-লাইন নয়! অনেকে কৃষকদের এই মৌলিক মতাদর্শগত চরিত্রসম্পন্ন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে গান্ধিবাদী আন্দোলন বা আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এক করে দেখতে চান। কিন্তু তা ঠিক নয়। আন্দোলনটি শান্তিপূর্ণ বলেই তা গান্ধিবাদী হয়ে যায় না। গান্ধী দেশের সম্পদকে শিল্পপতিদের হেফাজতে অছি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তার বিপরীতে কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে বৃহৎ ব্যবসার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। দুইটি বৃহৎ করপোরেট সংস্থার মুনাফা করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় কৃষিকে বেচে দিচ্ছেন— এর মধ্যে নিশ্চয়ই দুর্নীতি আছে, কিন্তু তাই-ই এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে এমন কোনও বোকা-বোকা দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের অংশ করে তোলে না যা কেবল বেআইনি আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অর্থাগমের মধ্যেই দুর্নীতিকে দেখতে পায়। মোদী মহাশয় আসলে ওইরকম সবকিছুকে আইনি করে দেওয়ার জন্যই আইন পাল্টাতে বসেছিলেন।

এই কৃষক আন্দোলন তার নাছোড় মনোভাব ও টিকে থাকার ক্ষমতায় অনন্য। বিষয়বস্তুর গোড়ায় গিয়ে পৌঁছয় এমন এক সোজাসাপটা মতাদর্শ দিয়ে শ্রেণি, জাতপাত, লিঙ্গভেদ ও ধর্ম বিচারে অপরাপরদের একসঙ্গে এনে ঐক্য তৈরিতেও এই আন্দোলন অনন্য। সেইজন্যই এই আন্দোলনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়নি। সরকার একে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে, আর এখন তা ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে।

এই আন্দোলন অবশ্য আমাদের যুগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষের ভাগ-করে-নেওয়া

জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া আন্দোলন কি বিশেষ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মতাদর্শ সহ জীবন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ রূপান্তরকারী গণমুখী রাজনীতি দিয়ে রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে প্রতিস্থাপন করতে পারে? রাজনৈতিক পার্টিগুলো ইতিমধ্যেই বারংবার তাদের অক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে। এই পার্টিগুলো এমন এক প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী খেলায় মগ্ন যেখানে অর্থ হল নির্ণায়ক, যেখানে মনুষের পূর্বসংস্কারকে ব্যবহার করে নেওয়ার চালাকি অপরিহার্য, যেখানে কোদালকে কোদাল বলা সমীচীন নয় কারণ প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে বাস্তবের চেয়ে নির্মিত প্রতিমার গুরুত্ব অনেক বেশি, আর ভ্রম সৃষ্টি করে জনগণকে মোহিত করে রাখা ও অসুন্দর বাস্তবকে ভুলিয়ে রাখাই হল খেলার মূল লক্ষ্য। কাজ করার চেয়ে ভালো কথা বলতে পারা সেখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নির্মিত প্রতিমা দিয়ে বাস্তবকে প্রতিস্থাপন করার চূড়ান্ত হাতিয়ার হল গণপ্রচারমাধ্যম ও বিজ্ঞাপন, এবং তা প্রয়োগের জন্যই বড় শিল্পপতিদের কাছ থেকে বড় অর্থ-সমর্থন অপরিহার্য। পার্টির শক্ত বাঁধুনি ধরে রাখতে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সাংগঠনিক শৃঙ্খলা লাগে— কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মত ও পথ ঠিক করে দেয়, অনুগামীরা তা অনুসরণ করে চলে। এখন আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের যে ধাঁচার সঙ্গে পরিচিত, তার মূলে রয়েছে ধর্ম ও জাতপাতকে (অপ)ব্যবহার করে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করা। আন্দোলনের পথ ধরে এই বিকৃতিগুলোকে যে একটা বড় মাত্রা অবধি সংশোধন করা ও অতিক্রম করা যায় তা কৃষকদের আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে।

কৃষকরা নির্দিষ্ট কোনও বিরোধী পার্টিকে ভোট দিতে বলেনি। তারা বিজেপি-র কৃষি-বিরোধী নীতির বিরোধিতা করেছে, মোদীর সম্রাটসুলভ ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হয়েছে, ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করার মোদী-কৌশলে বিতৃষ্ণ বোধ করেছে, আর মোদী যে তাদের সঙ্গে ভদ্র আচরণটুকুও করতে অসমর্থ তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছে। প্রতিবাদ জরি রাখতে গিয়ে ৬৭০ জন কৃষক যে প্রাণ হারিয়েছেন, ত নিয়ে মোদী একবারও কোনও দুঃখ-অনুতাপ প্রকাশ করেননি; তাঁর নিজের মন্ত্রীসভার মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায়

কৃষকদের উদ্দেশ্যে হুমকি-শাসানি উগরানোর পর সেই মন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধে যখন কৃষকদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়ে চারজন কৃষককে হত্যা করার অভিযোগ উঠল, তখনও তিনি অখণ্ড নীরবতা বজায় রাখলেন।

নিজেদের ভাগ-করে-নেওয়া জীবন-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভোট কাকে দেব তা ঠিক করার জন্য মানুষের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে। মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে কেবলমাত্র করপোরেটদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রবর্তিত সরকারি নীতিগুলোকে তারা নিজেরা বিচার করে দেখুক। সরকারের গণতন্ত্র-বিরোধী ও সংবিধান-বিরোধী অভিপ্রায় সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন করেছে এই আন্দোলন।

এর আগেও আন্দোলনের ফলে কোনও রাজনৈতিক পার্টির ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা থেকে সরার ঘটনা ঘটেছে। আম আদমি পার্টি (আপ) দিল্লিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল আন্না হাজারের নেতৃত্ব দেওয়া এমন এক দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের ঘাড়ে চড়ে, যা গর্বের সঙ্গে দাবি করত যে তার কোনও মতাদর্শ নেই! তার পর থেকে তা যে কোনও উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকাকেই নিজের মতাদর্শ করে নিয়েছে। একদা বিক্রমশালী সিপিএম (মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি), নিজ মার্কসবাদী মতাদর্শ নিয়ে যার গর্বের অন্ত ছিল না, পশ্চিমবঙ্গে তা এতই গর্বোদ্ধত হয়ে উঠেছিল যে কৃষকদের জীবন-মরণ প্রশ্নটাও তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল। তারপরই কৃষকদের সঙ্গে নাগরিক সমাজও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সাধারণ মানুষের সেই মেজাজের পিঠে সওয়ার হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় চড়ে বসে। অতঃপর সে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে সিপিএম-কে প্রায় মুছে দিয়েছে, পাশাপাশি শেষ নির্বাচনে বিজেপি-কেও ধূলিস্মাৎ করে ছেড়েছে। কংগ্রেস পার্টি সাধারণ জনসমর্থন ও প্রচুর সুফল অর্জন করে ২০০৯-য়ের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি-কে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল, যখন সে সার্বজনীন তথ্য অধিকার আইন ও দেশজোড়া গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন পাশ করায়। কিন্তু তার পর থেকেই সে ক্রমশ আরও বেশি বেশি করে প্রমাণ করে চলেছে যে সে ঠিক

ততদূর অবধিই ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, যতদূর পর্যন্ত পারিবারিক রাজধারায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। অন্যদিকে, বিজেপি তার এই বিশ্বাস নিয়েই উদ্ধত যে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিভেদকে চতুরভাবে ব্যবহার করতে পারলেই নির্বাচনী জয় তার মুঠোয় ধরা থাকবে আর আধ-চালাকের মতো সে হিন্দু জাতভিত্তিক সমাজের সমস্ত নোংরা বিভেদমূলক দিক, দলিত ও তফসিলী বর্গের উপর সমস্ত নিপীড়ন এবং জনজাতিদের অধিকারের অবদমন এভাবে চাপা দিয়ে রখতে পারবে।

গণতান্ত্রিক ভারতের রাজনৈতিক পার্টিগুলো এই যে বিবিধ রোগলক্ষণে আক্রান্ত, তার অনেকগুলোরই প্রতিষেধক হিসেবে এখনও অবধি এই কৃষক আন্দোলন কাজ করেছে।

বেকারত্ব একটি অত্যন্ত বিপর্যস্তকারী সমস্যা, অথচ কেবলমাত্র নির্বাচনের সময়েই তা আলোচনায় উঠে আসে। এই সমস্যাকে সামাল দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা তৈরি করার কাজেও এখনও অবধি কোনও রাজনৈতিক দল গুরুত্ব সহকারে হাত দেয়নি। দারিদ্র্য, শিশুদের অপুষ্টি, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি-বিকাশের নামে জীবিকা ও প্রকৃতির নির্বিচার ধ্বংস— এই সমস্তই কেবল নির্বাচনের সময় নজরে ভেসে ওঠা ক্ষণিকের ভাবনাবস্তু হয়ে রয়েছে। সমস্ত পার্টিই ক্ষমতাসীন অবস্থায় এই কুৎসিত বিপজ্জনক প্রবণতাগুলোকে বাড়িয়ে নিয়ে যায়, আর বিরোধী অবস্থানে থাকলে এসবের বিরোধিতা করে।

কৃষক আন্দোলন দ্ব্যর্থহীনভাবে এই খেলার পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। এই সবের পিছনে একটাই উদ্দেশ্য কাজ করছে, সেই উদ্দেশ্য হল গুটিকয় বৃহৎ করপোরেট সংস্থার হাতে গোটা দেশের অর্থনীতির চাবিকাঠি তুলে দেওয়া এবং দরিদ্রদের দিকে কখনও কখনও কিছু দয়াভিক্ষা ছুঁড়ে দিয়ে তাদের বাধ্য নীরব করে রাখা। এরমধ্যে মূলত মাত্রাভেদের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন, মোদী মহাশয় এই আদর্শ মাঠে কার্যকরী করার কাজে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও বেপরোয়া চালে আর সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন। কৃষক আন্দোলন এই সাধারণ অবস্থাটিকে আড়াল

সরিয়ে সবার সামনে এনে দিয়েছে। সব দ্বন্দ্বেরই যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাধান হয়ে গেছে, তা নয়, তবে, ভারতের কৃষকদের বোঝাবুঝির কল্যাণে একটি সূচনাবিন্দু তৈরি হয়েছে। তার থেকেও বড় কথা হল এই যে এর মধ্য দিয়ে সাধারণ গরীব মানুষ এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন যে নিজেরা বোঝাবুঝি করে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে প্রতিরোধে নামলে বদল ঘটানো যায়। একদিক থেকে এ হল গোটা রাজনীতিজীবী শ্রেণির কাছেই একটা ভয়ের বিষয়, কারণ তাদের ব্যবসাদারি এরপর আর ঠিক আগের মতো একইভাবে চালানো যাবে না। অকেজো গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অলংকারশাস্ত্র পেরিয়ে কৃষকদের আন্দোলন একেই আমাদের নবার্জিত বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ— বিপ্লব নায়ক।)